অভিসরণ / ABHISARON
A Multilingual International Peer-Reviewed Research Journal
Volume 1, Issue II, July 2026, PP. 181-189
www.abhisaron.com
ISSN-3139-4027(Online)
DOI - https://dx.doi.org/10.67757/abhisaron.2026.v1i2.026

Environmental Ethics and Environmental Justice : A Philosophical Analysis / পরিবেশ নীতিবিদ্যা ও পরিবেশগত ন্যায়বিচার : একটি দার্শনিক বিশ্লেষণ

KAMAKHYA PRAMANICK/কামাক্ষ্যা প্রামানিক
স্টেট এডেড কলেজ টিচার, রানাঘাট কলেজ
Email: kpramanickju575@gmail.com

Accepted: 07.07.2026
Published: 20.07.2026

Keywords:

পরিবেশ নীতিবিদ্যা, পরিবেশগত ন্যায়বিচার, মানবকেন্দ্রিকতাবাদ, বাস্তুকেন্দ্রিকতাবাদ, জলবায়ু পরিবর্তন, টেকসই উন্নয়ন, আন্তঃপ্রজন্ম ন্যায়বিচার, ভারতীয় পরিবেশ নীতিবিদ্যা

Abstract:

পরিবেশ নীতিবিদ্যা সমকালীন ব্যবহারিক বা ফলিত নীতিবিদ্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপবিভাগ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, সেই মিথস্ক্রিয়ার পটভূমি এবং ফলাফল এইসব বিষয়কে কেন্দ্র করে যে নীতিগুলো গঠিত হয় এবং তা যে বিদ্যার আলোচ্য বিষয় হয় তাকে বলে পরিবেশ নীতিবিদ্যা। পরিবেশগত সংকট বর্তমান বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। জলবায়ু পরিবর্তন, বন উচ্ছেদ, জীববৈচিত্র্যের ধ্বংস, শিল্পদূষণ, মাটির উর্বরতা হ্রাস এবং প্রাকৃতিক সম্পদের নির্বিচার ব্যবহার মানব সভ্যতার অস্তিত্বকে গভীরভাবে প্রভাবিত করছে। এই প্রেক্ষাপটে পরিবেশ নীতিবিদ্যা মানুষ ও প্রকৃতির সম্পর্ককে নৈতিক দৃষ্টিভকোন থেকে ব্যাখ্যা করে এবং পরিবেশগত ন্যায়বিচার সমাজের প্রতিটি মানুষের জন্য সমান পরিবেশগত অধিকার ও পরিবেশগত সুবিধা-অসুবিধার ন্যায্য বণ্টনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা চিন্তা করে এজন্য পরিবেশ সচেতনতা একান্ত প্রয়োজন। এই পটভূমিতে নীতিদর্শনের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ফলিত বা ব্যবহারিক শাখা হিসেবে 'পরিবেশ নীতিবিদ্যা' মানুষ এবং প্রকৃতির মধ্যকার পারস্পরিক নৈতিক সম্পর্কের পুনর্মূল্যায়ন করে।

এই গবেষণাপত্রে পরিবেশ নীতিবিদ্যার ধারণা, উৎপত্তি, বিকাশ, মানবকেন্দ্রিকতাবাদ, প্রাণকেন্দ্রিকতাবাদ, বাস্তুকেন্দ্রিকতাবাদ, সামাজিক বাস্তবাদ, বাস্তুনারীবাদ, পরিবেশগত ন্যায়বিচার, জলবায়ু ন্যায়বিচার, আন্তঃপ্রজন্ম ন্যায়বিচার, ভারতীয় দর্শনে পরিবেশ ভাবনা এবং বর্তমান বিশ্বে পরিবেশ সংরক্ষণের নৈতিক গুরুত্ব বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গবেষণায় দেখানো হয়েছে যে, পরিবেশগত সংকট মোকাবিলায় কেবল আইন বা প্রযুক্তি যথেষ্ট নয় বরং নৈতিক মূল্যবোধ, সামাজিক দায়িত্ববোধ ও কীভাবে পরিবেশগত ন্যায়বিচার জাগ্রত করার মাধ্যমে একটি সুস্থ, ভারসাম্যপূর্ণ ও টেকসই পৃথিবী গড়ে তোলা সম্ভব, তা অত্যন্ত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

Discussion:

বর্তমান যুগে পরিবেশগত সংকট মানবসভ্যতার অন্যতম গুরুতর সমস্যা। শিল্পবিপ্লবের পর থেকে মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতির ফলে প্রকৃতির ওপর ক্রমাগত চাপ বেড়েছে। বনভূমি ধ্বংস, নদী দূষণ, বায়ু দূষণ, অতিরিক্ত খনিজ উত্তোলন, অতি বেগুনি রশ্মি বেড়ে যাওয়া, DDT সারের অতিরিক্ত প্রয়োগ এবং জীবাশ্ম জ্বালানির অতিরিক্ত ব্যবহার পৃথিবীর পরিবেশগত ভারসাম্যকে বিপন্ন করেছে। এই পরিস্থিতিতে প্রশ্ন ওঠে, মানুষ কি কেবল নিজের স্বার্থে প্রকৃতিকে ব্যবহার করতে পারে, নাকি প্রকৃতির প্রতিও তার নৈতিক দায়িত্ব রয়েছে? এই প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করতেই পরিবেশ নীতিবিদ্যার বিকাশ ঘটেছে। পরিবেশ নীতিবিদ্যা এমন একটি ব্যবহারিক বা ফলিত নীতিবিদ্যা যা মানুষ ও প্রকৃতির সম্পর্ককে নৈতিকতার ভিত্তিতে বিচার করে এটি শুধু মানুষের কল্যাণই নয় বরং সমগ্র জীবজগৎ এবং পরিবেশের কল্যাণকে সমান গুরুত্ব দেয়। পরিবেশ নীতিবিদ্যা বলে প্রকৃতির প্রতিটি উপাদান— গাছপালা, প্রাণী, নদী, পাহাড়, বনভূমি, পর্বত নিজস্ব মূল্য বহন করে এবং তাদের অস্তিত্ব রক্ষার নৈতিক প্রয়োজন রয়েছে। তাই ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা চিন্তা করে পরিবেশ সচেতনতা একান্ত প্রয়োজন। পরিবেশগত ন্যায়বিচার এই আলোচনাকে আরও বিস্তৃত করে। এটি বলে যে, পরিবেশের সুবিধা ও ক্ষতির পরিমাপ সমাজের সব মানুষের মধ্যে সমানভাবে বণ্টিত হওয়া উচিত এবং পরিবেশ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। বাস্তুবিজ্ঞানের বিভিন্ন গবেষণায় উঠে এসেছে যে, এই পৃথিবীতে আমরা একে অপরের সঙ্গে পারস্পরিক নির্ভরতার সম্পর্কে সম্পর্কিত, আর এই পারস্পরিকতার দৌলতেই টিকে থাকে বাস্তুব্যবস্থাসমূহ তথা পরিবেশের ভারসাম্য।

পরিবেশ নীতিবিদ্যার ধারণা:

পরিবেশ নীতিবিদ্যা সমকালীন ব্যবহারিক বা ফলিত নীতিবিদ্যার গুরুত্বপূর্ণ শাখা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে, যা মানুষ ও প্রকৃতির পারস্পরিক সম্পর্কের নৈতিক মূল্যায়ন করে। পরিবেশ নীতিবিদ্যা মানুষের যাবতীয় কর্মকাণ্ড, জীবনযাপন-রীতি এবং কর্মনীতি এককথায় আমাদের যাবতীয় আচার-আচরণ বা উদ্যোগ যা কোনো না কোনোভাবে প্রকৃতি পরিবেশকে প্রভাবিত করে তা নিয়ে আলোচনা করে। এই সব কর্মকাণ্ডের পটভূমি ও ফলাফল পরিবেশ নীতিশাস্ত্রের বিবেচ্য বিষয় তো হয়ই, একই সঙ্গে এ ধরনের কাজকর্মের মূলে যেসব কর্মনীতি এবং বিশ্ববীক্ষা কাজ করে, সেগুলিও পরিবেশ নীতিশাস্ত্রের বিবেচনার মধ্যে পড়ে। কেবলমাত্র মানুষই নয়, জল, মাটি, পাহাড়, পরিবেশ, গাছপালা, বাতাসসহ পৃথিবীর সহস্র পুরো জীবমন্ডল পরিবেশ নীতিবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত। তাই পরিবেশ সংরক্ষণে নৈতিক কর্তব্য হিসেবে মনে করেছে। পরিবেশ নীতিবিদ্যা কেবলমাত্র নৈতিক তাৎপর্যপূর্ণ আচরণেরই বিচার করে না, মানুষের আচরণের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সম্পর্কিত বিভিন্ন ধ্যান-ধারণা,

মানদন্ড ও তত্ত্বের আলোচনাও করে থাকে। বর্তমান সময়ে পরিবেশ নীতিবিদ্যা কেবল দর্শনের বিষয় নয়; এটি আইন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সঙ্গেও নিবিড়ভাবে যুক্ত।

পরিবেশ নীতিবিদ্যার উৎপত্তি ও বিকাশ:

পৃথিবীতে মানব জীবন যেমন প্রাচীন তেমনি পরিবেশ চেতনাও প্রাচীন, তবে পরিবেশ নীতিবিদ্যা বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে একটি স্বতন্ত্র দার্শনিক শাখা হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। যদিও মানুষ ও প্রকৃতির সম্পর্ক নিয়ে প্রাচীনকাল থেকেই বিভিন্ন ধর্ম ও দর্শনে আলোচনা ছিল, তবুও আধুনিক অর্থে পরিবেশ নীতিবিদ্যার প্রকাশ ঘটে মূলত ১৯৬০-এর দশকে। এই সময় শিল্পায়ন, জনসংখ্যাবৃদ্ধি, বনভূমি ধ্বংস, বায়ু ও জলদূষণ, অতিরিক্ত কীটনাশক ব্যবহার এবং পারমাণবিক পরীক্ষার ফলে বায়ুমন্ডলের স্বাভাবিক ভারসাম্য নষ্ট হওয়ায় পরিবেশগত সংকট প্রকট হয়ে ওঠে। এর ফলে দার্শনিক, সমাজবিজ্ঞানীরা উপলব্ধি করেন যে, পরিবেশকে কেবল অর্থনৈতিক সম্পদ হিসেবে দেখলে মানবসভ্যতার ভবিষ্যৎ বিপন্ন হবে। ১৯৬২ সালে মার্কিন বিজ্ঞানী ও পরিবেশবাদী রাচেল কারসন তাঁর যুগান্তকারী গ্রন্থ 'Silent Spring'-এ অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে দেখান কীভাবে ডিডিটি (DDT) এবং অন্যান্য রাসায়নিক কীটনাশক আমাদের সামগ্রিক পরিবেশ, খাদ্যশৃঙ্খল ও প্রাণীদের জগৎ ধ্বংস করে এক নীরব বসন্তের দিকে পৃথিবীকে ঠেলে দিয়েছে। যদিও লিওপোল্ডের তত্ত্বের মধ্য দিয়েই শুরু হয়েছিল বাস্তুকেন্দ্রিক নীতিশাস্ত্রের চিন্তাভাবনা তথাপি বিংশ শতাব্দীর সাতের দশকের গোড়ার দিক থেকে বৈজ্ঞানিক গবেষণার ইন্ধন পেয়ে এই বাস্তুতন্ত্রের পরিবেশ ভাবনা ব্যাপক আন্দোলনের রূপ নেয়। আল্ডো লিওপোল্ড তাঁর 'Land Ethic' গ্রন্থে মানুষকে প্রকৃতির অভিভাবক হিসেবে নয়, বরং প্রকৃতির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিবেচনা করার আহ্বান জানান। এরপর ১৯৭৩ সালে নরওয়ের দার্শনিক আর্নে নেস তাঁর বিখ্যাত 'The Shallow and the Deep, Long Range Ecology Movements: A Summary' প্রবন্ধে প্রচলিত অগভীর বাস্তচিন্তা (Shallow Ecology)-এর সমালোচনায় মুখর হন এবং এর থেকে গভীর বাস্তবাদ (Deep Ecology)-কে আলাদা করেন। তিনি গভীর বাস্তবাদের মুখোশ খুলে ফেলে বললেন যে মানবকেন্দ্রিক পরিবেশ চিন্তা পরিবেশ সমস্যার সমাধানের সন্ধান দিতে পারে না। ঠিক এই সময়েই নারীবাদী বাস্তবাদ (Eco-Feminism) নামে পরিবেশের আরেকটি ধারণার উন্মেষ ঘটে। ১৯৭৪ সালে ফ্রাঙ্কোজ ডি'আওবোন তাঁর 'Feminism or Death' গ্রন্থে বলেন, নারী ও পরিবেশ উভয়েই শোষণ, উৎপীড়ন ও বঞ্চনার শিকার। জৈবিক ও সামাজিক ভূমিকার মধ্যে প্রকৃতি ও নারীর একটি সহজাত সম্পর্ক আছে। এই ধারণা মূলত পরিবেশ নীতিবিদ্যাকে দর্শনের একটি স্বতন্ত্র, আধুনিক ও ফলিত শাখা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করেছে।

পরিবেশগত ন্যায়বিচারের ধারণা:

পরিবেশগত ন্যায়বিচার বলতে পরিবেশের সুফল ও কুফল সমাজের সকল মানুষের মধ্যে ন্যায্যভাবে বন্টিত হওয়াকে বোঝায়। এই ধারনার মূল লক্ষ্য হলো—কোনো ব্যক্তি, জাতি, ধর্ম, বর্ণ বা অর্থনৈতিক শ্রেণী যেন পরিবেশ দূষণ, জলবায়ু পরিবর্তন কিংবা প্রাকৃতিক সম্পদের সংকটের অতিরিক্ত বোঝা বহন করতে বাধ্য না হয়।

১৯৮০-এর দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পরিবেশগত ন্যায়বিচার আন্দোলনের সূচনা হয়। দেখা যায় দূষণকারী শিল্প, বর্জ্য ফেলার স্থান এবং ঝুঁকিপূর্ণ কারখানাগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর এলাকায় স্থাপন করা হয়। ফলে পরিবেশগত ক্ষতির প্রধান শিকার হয় সমাজের দুর্বল জনগোষ্ঠী। এই বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ থেকেই পরিবেশগত ন্যায়বিচারের ধারণার বিকাশ ঘটে। পরিবেশগত ন্যায়বিচারের তিনটি মৌলিক ভিত্তি হল—

১. বণ্টনমূলক ন্যায়বিচার: পরিবেশগত সম্পদ ও ঝুঁকির ন্যায্য বণ্টন।

২. অংশগ্রহণমূলক ন্যায়বিচার: পরিবেশ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
৩. স্বীকৃতিমূলক ন্যায়বিচার: সকল জনগোষ্ঠীর অধিকার, সংস্কৃতি ও মর্যাদার সমান স্বীকৃতি প্রদান।

আন্তঃপ্রজন্ম ন্যায়বিচার:

পরিবেশ নীতিবিদ্যার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ধারণা হল আন্তঃপ্রজন্ম ন্যায়বিচার। এর অর্থ হল বর্তমান প্রজন্ম এমনভাবে প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করবে যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্মও সমানভাবে সেই সম্পদ ব্যবহার করতে পারে। তাই প্রয়োজনের অতিরিক্ত প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার থেকে বিরত থাকতে হবে। যদি বর্তমান প্রজন্ম নির্বিচারে বন উজাড় করে, জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহার করে এবং পরিবেশ দূষণ বৃদ্ধি করে তবে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম একটি অনিরাপদ ও দূষিত পৃথিবী উত্তরাধিকারসূত্রে পাবে। তাই পরিবেশ সংরক্ষণ বর্তমান প্রজন্মের নৈতিক দায়িত্ব। কেননা পরিবেশ সংরক্ষণ না হলে গোটা প্রাণীজাতি, গাছপালা, পাহাড়, পর্বত ধ্বংস হয়ে যাবে।

জলবায়ু ন্যায়বিচার:

জলবায়ু পরিবর্তন বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে বড় পরিবেশগত সংকট। উন্নত দেশগুলোর দীর্ঘদিনের শিল্পায়নের ফলে বিপুল পরিমাণ কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গত হয়েছে। ফলে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। এর ক্ষতিকর প্রভাব সবচেয়ে বেশি ভোগ করছে অনুন্নত ও দরিদ্র দেশগুলি। জলবায়ু ন্যায়বিচারের মূল দাবিগুলি হল —

১. উন্নত দেশগুলোর অধিক দায়িত্বগ্রহণ।
২. উন্নয়নশীল দেশগুলিতে আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান।
৩. প্রচুর পরিমাণে বৃক্ষরোপণ করা যাতে করে কার্বন নিঃসরণ হ্রাস হয়।
৪. ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর জন্য জলবায়ু তহবিল গঠন করা।

এই নীতির মাধ্যমে বৈশ্বিক পর্যায়ে পরিবেশগত বৈষম্য কমানোর চেষ্টা করা হয়।

পরিবেশ নীতিবিদ্যার মূল তত্ত্ব ও দৃষ্টিভঙ্গিসমূহ

পরিবেশ নীতিবিদ্যার সামগ্রিক আলোচনাকে মূলত দুটি প্রধান দার্শনিক ভাবধারায় বিভক্ত করা যায়। মানুষের সাথে প্রকৃতির প্রকৃত সম্পর্ক ঠিক কেমন হওয়া উচিত এবং প্রকৃতির প্রতি মানুষের কী দায়িত্ব রয়েছে, তা এই দুটি তত্ত্বের বিশ্লেষণের মাধ্যমে নির্ধারিত হয়। এই দুটি তত্ত্ব হলো—

১. মানবকেন্দ্রিকতাবাদ
২. অ-মানবকেন্দ্রিকতাবাদ

১. মানবকেন্দ্রিক নীতিবিদ্যা:

এই মত অনুসারে প্রকৃতির প্রতি আমাদের কোনোপ্রকার প্রত্যক্ষ দায়িত্ব থাকতে পারে না। এই দায়িত্ব পরোক্ষ। মানুষের প্রতি আমাদের কিছু নৈতিক দায়িত্ব আছে। এই দায়িত্ব থাকার জন্যই প্রকৃতিকে সংরক্ষণ করার প্রয়োজন হয়। প্রকৃতির প্রতি যদি আমাদের কোনো নৈতিক দায়িত্ব থাকে তাহলে সেই দায়িত্বের উৎস হলো মানুষের প্রতি কর্তব্যকর্ম। মানুষের প্রতি কর্তব্য আছে বলেই প্রকৃতির প্রতি আমাদের কর্তব্য আছে। তাই প্রকৃতির প্রতি আমাদের কর্তব্যকে পরোক্ষ কর্তব্য বলা হয়েছে। এই জাতীয় নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিকে নৃ-কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি বা Anthropocentric বলা হয়। এইভাবে মানুষের স্বার্থ বিচার করে যে নীতিবিদ্যার উদ্ভব হয় তার নাম নৃ-কেন্দ্রিক নীতিবিদ্যা। এই মতে মানুষের স্বার্থের কথা বিবেচনা না করে পরিবেশ সম্পর্কে চিন্তা করার কোনো অর্থ হয় না।

প্রকৃতির প্রতি নিঃস্বার্থ কর্তব্যবোধের চিন্তা অর্থহীন। আমরা পরিবেশকে সংরক্ষণ করা উচিত বলে মনে করি কারণ পরিবেশকে আমাদেরই স্বার্থে সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। এই মতবাদে প্রকৃতিকে একটি পরতঃ মূল্য বা যান্ত্রিক মূল্য হিসেবে দেখা হয়। উদাহরণস্বরূপ— একটি জঙ্গলকে বাঁচিয়ে রাখা দরকার, কারণ তা মানুষকে জীবনদায়ী অক্সিজেন দেয়, মূল্যবান কাঠ দেয় ও ফুল ফল দেয়। কাজেই বলা যায় প্রকৃতির নিজের কোনো মৌলিক অধিকার নেই, তার সমস্ত মূল্য মানুষের ভালো-মন্দের সাপেক্ষে নির্ধারিত হয়। একে 'অগভীর পরিবেশবাদ'-ও বলা হয়।

২. অ-মানবকেন্দ্রিকতাবাদ:

এই মতবাদে বলা হয় যে প্রকৃতি বা পরিবেশের প্রতি আমাদের নিঃস্বার্থ কর্তব্য বা দায়িত্ব আছে। এই দায়িত্ব প্রসঙ্গে নিজেদের স্বার্থ বিচার করার প্রয়োজন নেই। এই জাতীয় মতবাদকে নীতিবিদ্যায় Non-anthropocentric ethics বা অ-নৃকেন্দ্রিক নীতিবিদ্যা বলা হয়। আমরা প্রাণীদের হত্যা করতে পারি না কারণ এর ফলে তারা কষ্টভোগ করে। আবার আমরা বৃক্ষলতাকেও ধ্বংস করতে পারি না কারণ তাদেরও অস্তিত্বের মূল্য ও উদ্দেশ্য আছে। এই মতবাদে প্রকৃতিকে স্বতঃমূল্য হিসেবে দেখা হয়। কারণ এই তত্ত্বের মূল কথা হলো একটি পাহাড়, প্রকৃতি, সমুদ্র, একটি বিলুপ্তপ্রায় বন্যপ্রাণীর পৃথিবীতে টিকে থাকার অধিকার ঠিক ততটাই মৌলিক, যতটা একজন সভ্য মানুষের আছে। মানুষ তার নিজের স্বার্থের জন্য এদের ধ্বংস করতে পারে না। প্রকৃতির প্রতি মানুষের নৈতিক কর্তব্য রয়েছে।

বাস্তুকেন্দ্রিক মতবাদ (Ecocentrism):

বাস্তুকেন্দ্রিক মতবাদ পরিবেশ নীতিবিদ্যার একটি অন্যতম মতবাদ। এখানে কেবল পৃথক জীব নয়, সমগ্র বাস্তুতন্ত্রকে নৈতিক মূল্য দেওয়া হয়। এই মতবাদ অনুযায়ী বন, নদী, পাহাড়-পর্বত, প্রাণী, উদ্ভিদ, মাটি ও জল— সবকিছু নিয়েই একটি পূর্ণাঙ্গ পরিবেশ গঠন করে। তাই পরিবেশের একটি অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হলে পুরো বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য নষ্ট হয়। বাস্তুকেন্দ্রিক নীতিবিদ্যা মানুষকে প্রকৃতির শাসক হিসেবে নয়, বরং সহাবস্থানের অংশীদার হিসেবে বিবেচনা করে। বর্তমান পরিবেশ সংকট মোকাবিলায় এই দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত কার্যকর বলে মনে করা হয়।

ভূমিকেন্দ্রিক নীতিবিদ্যা:

প্রকৃতিকেন্দ্রিক পরিবেশ নীতিবিদ্যায় আল্ডো লিওপোল্ড একটি নতুন মাত্রা সংযোজন করেন। লিওপোল্ড একমাত্র দার্শনিক যিনি Ecology বা বাস্তুবিদ্যাকে প্রত্যক্ষভাবে নীতিবিদ্যার সঙ্গে যুক্ত করেন। তিনিই সর্বপ্রথম Land Ethic বা ভূমিকেন্দ্রিক নীতিবিদ্যার ধারণা প্রবর্তন করেন। তাঁর মতে, ভূমি শুধুমাত্র প্রাণহীন জড়বস্তু নয় যাকে মানুষ তার ইচ্ছামত ব্যবহার করতে পারে। Leopold-এর মতে, যা কিছু এই বৃহৎ প্রকৃতি তার স্বার্থ ও স্থায়িত্ব রক্ষা করা ভালো। তাই প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের ব্যবহার অতি বিনম্র ও সংযত হওয়া উচিত। এই মতবাদ, যা 'ভূমি নীতিবিদ্যা' নামে পরিচিত—তা আমাদের মধ্যে এক নৈতিক মনোভাব সৃষ্টি করে, যার ফলে আমাদের মধ্যে প্রাকৃতিক সবকিছুকেই সংরক্ষণ করার প্রবণতা লাভ করে।

গম্ভীর বাস্তুবিদ্যা (Deep Ecology):

গম্ভীর বাস্তুতত্ত্ব (Deep Ecology)-এর প্রবক্তা হলেন নরওয়ের দার্শনিক আর্নে নেস। তাঁর মতে, পরিবেশ রক্ষার জন্য কেবল দূষণ নিয়ন্ত্রণ যথেষ্ট নয়। মানুষের জীবনদর্শন ও মূল্যবোধের মৌলিক পরিবর্তন প্রয়োজন। আর্নে

নেস যাকে Deep Ecology বলেছেন তাকে একদিকে গম্ভীর এবং অন্যদিকে সর্বাত্মক বাস্তুবিদ্যা বলা চলে। এখানে বাস্তু সংরক্ষণের পিছনে মানুষের স্বার্থচিন্তা নেই। এখানে বাস্তুকে স্বভাবতঃ মূল্যবান বলা হয়েছে যা আমাদের মনোভাবের গভীরতার পরিচায়ক। আবার এখানে প্রকৃতির কোন বিশেষ অংশকে সংরক্ষণ করার পরিবর্তে বাস্তুর সর্বাত্মক সংরক্ষণের কথা বলা হয়। Deep Ecology বা গম্ভীর বাস্তুবিদ্যার মূল নীতিগুলি হল—

১. সকল জীবের নিজস্ব অন্তর্নিহিত মূল্য রয়েছে।

২. মানুষ প্রকৃতির অংশ, প্রকৃতির মালিক নয়।

৩. জীববৈচিত্র্য রক্ষা মানবজাতির নৈতিক দায়িত্ব।

৪. ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থ বিবেচনা করে পরিবেশ সংরক্ষণ করতে হবে।

এই বাস্তুবিদ্যা মানুষকে প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবনযাপনের শিক্ষা দেয় এবং পরিবেশবান্ধব উন্নয়নের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে।

ভারতীয় দর্শনে পরিবেশ নীতিবিদ্যা:

ভারতীয় দর্শনে পরিবেশ সংরক্ষণের ধারণা অতি প্রাচীন। বৈদিক যুগ থেকেই প্রকৃতিকে দেবতুল্য মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ—এই পঞ্চমহাভূতকে জীবনধারণের মৌলিক উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। প্রাচীন ঋষিরা উপলব্ধি করেছিলেন যে, প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট হলে মানুষের জীবনও বিপন্ন হবে। তাই তাঁরা প্রকৃতির প্রতি শ্রদ্ধা, সংযম ও দায়িত্ববোধের শিক্ষা দিয়েছেন। অথর্ববেদের পৃথিবী সূক্তে পৃথিবীকে 'মাতা' এবং মানুষকে তাঁর সন্তান হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। এর মাধ্যমে প্রকৃতির প্রতি দায়িত্বশীল আচরণের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। উপনিষদে বলা হয়েছে যে সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একই চৈতন্যের প্রকাশ। তাই মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে কোনো মৌলিক বিভেদ নেই। প্রকৃতিকে ধ্বংস করা মানে নিজের অস্তিত্বকেই বিপন্ন করা। তাই প্রকৃতির উপর অকারণ আঘাত করা নৈতিকভাবে অন্যায়। এই দৃষ্টিভঙ্গি আধুনিক পরিবেশ নীতিবিদ্যার 'Ecocentrism'-এর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ভারতীয় চিন্তাধারায় পরিবেশ নীতিবিদ্যাকে কখনও কখনও 'ঋণের ধারণার' মাধ্যমে এইভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। মানুষ শুধুই গ্রহীতা হতে পারে না। গ্রহণ মানুষের মধ্যে দায়বদ্ধতার জন্ম দেয়। এই দায়বদ্ধতাই পরিবেশের প্রতি তার নৈতিক দায়িত্বের ভিত্তি।

জৈনদর্শনে পরিবেশ নীতিবিদ্যা:

জৈনদর্শন পরিবেশ নীতিবিদ্যার অন্যতম শক্তিশালী ভিত্তি প্রদান করে। জৈন ধর্মের মূল নীতি অহিংসা শুধু মানুষের প্রতি নয়, সমস্ত জীবের প্রতিও প্রযোজ্য। ক্ষুদ্রতম প্রাণীকেও কষ্ট না দেওয়ার আদর্শ জৈন নীতিতত্ত্বের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। জৈন নীতিদর্শনে প্রতিটি জীবের স্বাধীন অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়েছে। বর্তমান পরিবেশ সংকটের প্রেক্ষাপটে জৈন দর্শনের এই মূল্যবোধ অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

বৌদ্ধ দর্শনে পরিবেশ নীতিবিদ্যা:

বৌদ্ধ দর্শনে সমস্ত জীবের প্রতি করুণা ও মৈত্রী প্রদর্শনের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। বুদ্ধদেব মনে করতেন মানুষ প্রকৃতির একটি অংশমাত্র। তাই প্রকৃতির প্রতি দায়িত্বশীল আচরণ করা উচিত। বৌদ্ধ দর্শনের প্রতীত্যসমুৎপাদ তত্ত্ব অনুসারে সমস্ত জীব ও বস্তু পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল। ফলে পরিবেশের একটি অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হলে সমস্ত জীবজগতের ওপর তার প্রভাব পড়ে। এই ধারণা আধুনিক বাস্তুসংস্থানের (Ecology) সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিবেশ ভাবনা:

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রকৃতিকে মানবজীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে দেখেছেন। তাঁর সাহিত্য, গান ও প্রবন্ধে প্রকৃতির প্রতি গভীর ভালোবাসা প্রকাশ পেয়েছে। তিনি 'তপাবন' শীর্ষক প্রবন্ধে বলেছেন –

'মানুষের লোকালয় যদি কেবলই একান্ত মানবময় হয়ে ওঠে, এর ফাঁকে ফাঁকে যদি প্রকৃতি কোনো মতে প্রবেশাধিকার না পায় তাহলে আমাদের চিন্তা ও কর্ম ক্রমশ কলুষিত ও গ্লানিগ্রস্ত হয়ে নিজের অতলস্পর্শী আবর্জনার মধ্যে আত্মহত্যা করে মরে।'

এর মাধ্যমে তিনি প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের আত্মিক সম্পর্ক গড়ে তোলার কথা বলেছেন। শান্তিনিকেতনে তিনি উন্মুক্ত প্রাকৃতিক পরিবেশে শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন। তাঁর মতে, পরিবেশবান্ধব শিক্ষা সমাজে নৈতিক চেতনা সৃষ্টি করে।

পরিবেশগত নীতিবিদ্যা ও টেকসই উন্নয়ন:

টেকসই উন্নয়ন বলতে এমন উন্নয়নকে বোঝায় যা বর্তমান প্রজন্মের চাহিদা পূরণ করে, কিন্তু ভবিষ্যৎ প্রজন্মের চাহিদা পূরণের সক্ষমতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে না। পরিবেশ নীতিবিদ্যা টেকসই উন্নয়নের নৈতিক ভিত্তি প্রদান করে। টেকসই উন্নয়ন মনে করে যে, অর্থনৈতিক উন্নয়ন অবশ্যই পরিবেশ সংরক্ষণ এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। প্রাকৃতিক সম্পদের সীমাহীন ব্যবহার কখনোই প্রকৃত উন্নয়ন হতে পারে না। বর্তমান বিশ্বে নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার, বৃক্ষরোপণ, বর্জ্য পুনর্ব্যবহার, সৌরশক্তির ব্যবহার, জল সংরক্ষণ এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণ টেকসই উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। পরিবেশ নীতিবিদ্যা এই কার্যক্রমগুলিকে শুধু ব্যবহারিক নয়, বরং নৈতিক কর্তব্য হিসেবেও বিবেচনা করে।

পরিবেশ সংরক্ষণে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের ভূমিকা ও নৈতিক দায়িত্ব:

১. ব্যক্তির দায়িত্ব:

পরিবেশ রক্ষার প্রথম দায়িত্ব ব্যক্তির। প্রত্যেক মানুষ যদি দৈনন্দিন জীবনে পরিবেশবান্ধব আচরণ করে, তবে পরিবেশগত সমস্যার অনেকটাই সমাধান সম্ভব। যেমন –

অপ্রয়োজনীয় প্লাস্টিক ব্যবহার কমানো

নিয়মিত বৃক্ষরোপণ করা

পরিবেশবান্ধব যানবাহন ব্যবহার করা

বর্জ্য যথাযথভাবে পৃথকীকরণ ও পুনর্ব্যবহার করা

জল ও বিদ্যুতের অপচয় রোধ করা

পরিবেশ সচেতন নাগরিকই একটি সুস্থ সমাজ গঠনের ভিত্তি।

২. সমাজের দায়িত্ব:

সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান – বিদ্যালয়, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং গণমাধ্যম – পরিবেশ সচেতনতা গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সমাজের দায়িত্ব হল – পরিবেশ শিক্ষার বিস্তার করা, বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি গ্রহণ করা, পরিবেশ রক্ষায় সচেতনতা বৃদ্ধি করা। তাই বলা যায় নৈতিক শিক্ষা ও সামাজিক দায়িত্ববোধ পরিবেশ সংরক্ষণের অন্যতম ভিত্তি।

৩. রাষ্ট্রের দায়িত্ব:

পরিবেশ সংরক্ষণে রাষ্ট্রের দায়িত্ব সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। কেননা রাষ্ট্র কঠোর পরিবেশ আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে, বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ করে, শিল্প দূষণ নিয়ন্ত্রণ করে, নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি করে এবং জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করে। তাই রাষ্ট্রের উচিত উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রতিটি ক্ষেত্রে পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন বাধ্যতামূলক করা। পরিবেশ রক্ষার জন্য আন্তর্জাতিক পরিবেশ আন্দোলন ও বিভিন্ন উদ্যোগ বিশ্বব্যাপী নেওয়া হয়েছে। যেমন –

কিয়োটো প্রোটোকল (১৯৯৭): গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন কমানোর আন্তর্জাতিক উদ্যোগ।

প্যারিস জলবায়ু চুক্তি (২০১৫): বৈশ্বিক উষ্ণায়ন নিয়ন্ত্রণে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার অন্যতম চুক্তি।

উপসংহার

পরিবেশ নীতিবিদ্যা বর্তমান বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নীতিদার্শনিক আলোচনার ক্ষেত্র। ক্রমবর্ধমান শিল্পায়ন, নগরায়ন, বন উজাড়, দূষণ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং প্রাকৃতিক সম্পদের অযৌক্তিক ব্যবহারের ফলে পৃথিবীর পরিবেশ আজ গভীর সংকটের সম্মুখীন। এই সংকটের সমাধান কেবল প্রযুক্তি বা আইন প্রয়োগের মাধ্যমে সম্ভব নয়; বরং মানুষের নৈতিক চেতনা, মূল্যবোধ এবং দায়িত্ববোধের বিকাশ অপরিহার্য। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই পরিবেশ নীতিবিদ্যা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এই গবেষণাপত্রে পরিবেশ নীতিবিদ্যার ধারণা, উৎপত্তি, তাত্ত্বিক ভিত্তি, মানবকেন্দ্রিক, জীবকেন্দ্রিক ও বাস্তুকেন্দ্রিক মতবাদ, Deep Ecology, ভারতীয় দর্শনে পরিবেশচিন্তা, টেকসই উন্নয়ন এবং ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের নৈতিক দায়িত্ব বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। আলোচনার মাধ্যমে স্পষ্ট হয়েছে যে, মানুষ প্রকৃতির মালিক নয়; বরং প্রকৃতির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাই প্রকৃতির প্রতি মানুষের আচরণ হওয়া উচিত দায়িত্বশীল, সংযমী ও নৈতিক। ভারতীয় দর্শন, বিশেষত বৈদিক, জৈন ও বৌদ্ধ চিন্তাধারা পরিবেশ সংরক্ষণের যে নৈতিক শিক্ষা প্রদান করে, তা আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। অহিংসা, অপরিগ্রহ, করুণা, সহাবস্থান এবং সংযমের মতো মূল্যবোধ আধুনিক পরিবেশ সংকট মোকাবিলায় কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। একই সঙ্গে আন্তর্জাতিক পরিবেশ আন্দোলন ও টেকসই উন্নয়নের ধারণা বিশ্বব্যাপী পরিবেশ সংরক্ষণের একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি করেছে।

পরিবেশ নীতিবিদ্যার মূল শিক্ষা হলো—প্রকৃতির প্রতি শ্রদ্ধা, প্রাকৃতিক সম্পদের সুষম ব্যবহার এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অধিকার রক্ষা করা। তাই পরিবেশ রক্ষা কেবল সরকারের দায়িত্ব নয়; বরং প্রত্যেক ব্যক্তি, পরিবার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সামাজিক সংগঠন এবং রাষ্ট্রের সম্মিলিত নৈতিক কর্তব্য। সর্বোপরি বলা যায়, পরিবেশ নীতিবিদ্যা শুধু একটি তাত্ত্বিক দর্শন নয়; এটি একটি জীবনদর্শন, যা মানুষকে প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও দায়িত্বশীল জীবনযাপনের শিক্ষা দেয়। বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বিশ্বের টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে পরিবেশ নীতিবিদ্যার নীতিসমূহ বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করা অত্যন্ত জরুরি।

Reference:

1. কারসন, র‍্যাচেল, সাইলেন্ট স্প্রিং, হটন মিফলিন প্রকাশনী, ১৯৬২।
2. ক্লেয়ার পামার : অ্যান ওভারভিউ অফ এনভায়রনমেন্টাল এথিকস্, এনভায়রনমেন্টাল এথিকস্ : অ্যান অ্যান্থোলজি, ব্ল্যাকওয়েল, ২০০৩
3. লিওপোল্ড, অ্যাল্ডো, এ স্যান্ড কাউন্টি অ্যালমানাক অ্যান্ড স্কেচেস হিয়ার অ্যান্ড দেয়ার, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৪৯।
4. নেস, আর্নে, ইকোলজি, কমিউনিটি অ্যান্ড লাইফস্টাইল, কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৯।
5. সোমনাথ চক্রবর্তী : কথায় কর্মে এথিকস্, প্রোগ্রেসিভ পাবলিশার্স; কোলকাতা, ২০০২।
6. সিঙ্গার, পিটার, প্র্যাকটিক্যাল এথিক্স, ৩য় সংস্করণ, কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০১১।
7. টেলর, পল ডব্লিউ, রেসপেক্ট ফর নেচার: পরিবেশ নীতিবিদ্যার একটি তত্ত্ব, প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৬।

Bibliography:

1. সোমনাথ চক্রবর্তী : কথায় কর্মে এথিকস্, প্রোগ্রেসিভ পাবলিশার্স; কোলকাতা, ২০০২।
2. কারসন, র‍্যাচেল, সাইলেন্ট স্প্রিং, হটন মিফলিন প্রকাশনী, ১৯৬২।
3. ক্লেয়ার পামার : অ্যান ওভারভিউ অফ এনভায়রনমেন্টাল এথিকস্, এনভায়রনমেন্টাল এথিকস্ : অ্যান অ্যান্থোলজি, ব্ল্যাকওয়েল, ২০০৩
4. টেলর, পল ডব্লিউ, রেসপেক্ট ফর নেচার: পরিবেশ নীতিবিদ্যার একটি তত্ত্ব, প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৬।
5. নেস, আর্নে, ইকোলজি, কমিউনিটি অ্যান্ড লাইফস্টাইল, কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৯।
6. রলস, জন, এ থিওরি অব জাস্টিস, হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৯৯।
7. লিওপোল্ড, অ্যাল্ডো, এ স্যান্ড কাউন্টি অ্যালমানাক অ্যান্ড স্কেচেস হিয়ার অ্যান্ড দেয়ার, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৪৯।
8. সিঙ্গার, পিটার, প্র্যাকটিক্যাল এথিক্স, কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০১১।